ওয়ান ইলেভেনের কুশীলব ॥ নাটের গুরু মাসুদ

ইন্টারোগেশন সেলে লে: জে: মাসুদের উপস্থিতিতে তারেক রহমানের ওপর নির্যাতন করা হয়

বিশেষ প্রতিবেদক : “তাদের মধ্যে কেউ কেউ দ্রুত কিছু করার তাগিদ দিতো। বিশেষ করে সাভার ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী দেশের অবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করতেন। আমি তাদের বুঝাতাম রাষ্ট্র পরিচালনায় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই।” এ হচ্ছে প্রাক-ওয়ান ইলেভেন পর্বে মেজর জেনারেল মাসুদের ভূমিকা নিয়ে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের উক্তি। সাভার ডিভিশন সম্পর্কে জেনারেল মইনের ভ্রমকে সংশোধন ইন্টারোগেশন সেলে লে: জে: মাসুদের করে বলতে হয়, এটি হচ্ছে নবম পদাতিক ডিভিশন, যার সদর দপ্তর সাভারে।

মেজর জেনারেল মাসুদ ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছোটভাই অবসরপ্রাপ্ত মেজর সাইদ এস্কান্দার এর আপন ভায়রা। কেবল আত্মীয়তার সুবাদে ২০০৫ সালে মেজর জেনারেল মাসুদকে নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি পদে নিয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। ঢাকা ডিভিশন নামে খ্যাত এ পদাতিক ডিভিশন আপৎকালে বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রীর অফিস-বাসভবন, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রেডিও-টিভি সেন্টারসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় এক কথায় গোটা রাজধানীর নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। অতীতে বাংলাদেশে সংঘটিত সকল সামরিক অভ্যুত্থানে এ ডিভিশনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ডিভিশনের অধীনে রয়েছে একটি স্বতন্ত্র ট্যাংক ইউনিট, যার সমর্থন ছাড়া বাংলাদেশে কোনো সামরিক অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সেনাপ্রধান লে: জেনারেল নাসিমের ব্যর্থ অভ্যুত্থানকালে কেবল এ ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল ইমামউজ্জামান জেনারেল নাসিমের সঙ্গে সহযোগিতা না করে রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করার জন্য ট্যাংক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। ফলে সে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং লে: জে: নাসিম আটক হন। নবম পদাতিক ডিভিশনের এ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মেজর জেনারেল মাসুদকে এ ডিভিশনে জিওসি হিসাবে নিয়োগ দেন।

১১ই জানুয়ারী ২০০৭ সেনাবাহিনী প্রধান লে: জেনারেল মইন ইউ আহমেদের লিখিত নির্দেশে মেজর জেনারেল মাসুদ সাভার সেনানিবাস হতে ২ কোম্পানী সৈন্য, ট্যাংক সহ ভারী অস্ত্র নিয়ে হাজির হন বঙ্গভবনে। আরো কয়েকটি ট্যাংক পাঠান বেতার ও টিভি কেন্দ্রে। রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল আমিনুল করিম ও এসএসএফ ডিজি মেজর জেনারেল সৈয়দ ফাতেমী আহমেদ রুমীর সহযোগিতায় কোন প্রতিরোধ ছাড়াই সশস্ত্র সৈন্যসহ সেনাপ্রধান লে: জে: মইন বঙ্গভবনে অনুপ্রবেশ করে এর দখল নিয়ে নেন। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে থাকা এসএসএফ-এর সহযোগিতায় সশস্ত্র মইন দলবল নিয়ে রাষ্ট্রপতির কক্ষে প্রবেশ করেন। এক পর্যায়ে সেনাপতি মইন রাষ্ট্রপতিকে চাপ দেন প্রধান উপদেষ্টা হতে পদত্যাগ করে দেশে জরুরী আইন জারী করতে। মইনের চাপের মুখেও রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তাদের তৈরী করা কাগজে সই করতে বিলম্ব করছিলেন, অপেক্ষা করছিলেন তাঁকে রক্ষায় নবম পদাতিক ডিভিশন থেকে মেজর জেনারেল মাসুদের সাহায্যের জন্য। এসময় বঙ্গভবনের চারপাশে সৈন্য ও ট্যাংক স্থাপন করে প্রায় এক ঘন্টা পরে রাষ্ট্রপতির কক্ষে হাজির হন মেজর জেনারেল মাসুদ। রাষ্ট্রপতি আশান্বিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে হতাশ করে মেজর জেনারেল মাসুদ সেনাপ্রধান মইনের সুরে সুর মিলিয়ে রাষ্ট্রপতিকে স্বাক্ষর করতে বলেন প্রধান উপদেষ্টা হতে পদত্যাগপত্র ও জরুরী আইনের আদেশসমূহে। রাষ্ট্রপতি বাধ্য হন মইন-মাসুদের কথামতো কাজ করতে। এভাবে মেজর জেনারেল মাসুদের বেইমানীতে দেশ ও সংবিধান রক্ষার শেষ আশাও তিরোহিত হয়ে যায়।

সেনাবাহিনীর চাকরিতে যোগদানের পূর্বে মাসুদউদ্দিন ছিলেন জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সদস্য। তার আগে ১৯৭৪ সালে তিনি চট্টগ্রামে কসকরের (ঈঙঝঈঙজ) ট্যালী ক্লার্ক ছিলেন। তখন দুর্ভিক্ষপীড়িত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সেবা ও খাদ্য খাতে চরম দুর্নীতি ও অরাজকতা বিরাজ করছিল। এমনি সময়ে জনসাধারনের জন্য আনা ২ ট্রাক নারকেল তেল চোরাকারবারীদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে দেন মাসুদ, যা ময়মনসিংহে খালাস হয়। এ ঘটনায় চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিভিন্ন থানায় মাসুদসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। মামলা হতে বাঁচার জন্য রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেন মাসুদ। ১৯৭৫ এর পটপরিবর্তনের পরে রক্ষী বাহিনী বিলুপ্ত করে এ বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ষষ্ঠ জেআরবি হতে সেনাবাহিনীতে মাসুদের কমিশন হয় ১ মে ১৯৭৫। পরবর্তীতে সাবেক সেনাপ্রধান লে: জেনারেল নূরউদ্দীন খানের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তার সেনাবাহিনীতে উত্থান ঘটে। মাসুদের এসকল দুর্বলতার কথা জেনারেল মইনের জানা ছিল। এসবের উপর ভিত্তি করে সেনাপ্রধান মইন মাসুদকে ঘায়েল করেন ১/১১ ঘটানোর প্রয়োজনে।

ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলায় মাসুদউদ্দিন চৌধুরীর জন্ম ১৯৫৪ সালে। অবসরপ্রাপ্ত এক হাবিলদারের দ্বিতীয় কন্যা জেসমিনকে বিয়ে করে মাসুদ খালেদা জিয়ার ছোট ভাই অবসরপ্রাপ্ত মেজর সাইদ এস্কান্দারের ভায়রা হন। সাঈদ এস্কান্দারের প্রভাবে ১৯৯৫ সালে সাভার সেনানিবাসের গুরুত্বপূর্ণ কর্নেল ষ্টাফ পদটি বাগিয়ে নেন মাসুদ। ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পরে কর্নেল মাসুদকে কুমিল্লা সেনানিবাসে একটি গোয়েন্দা ইউনিটের প্রধান করে বদলি করা হয়। ২০০১ সালে বিএনপি সরকার গঠনের পরে মাসুদকে কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে ঢাকায় এনে ডিজিএফআইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (সিআইবি)-র পরিচালক করা হয়। এ সময় মাসুদ প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উত্থান-পতনের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হন বলে অনেকে মনে করেন। পরপর ব্রিগেডিয়ার ও মেজর জেনারেল পদে ২টি পদোন্নতি দিয়ে ২০০৩ সালে মাসুদকে কুমিল্লা সেনানিবাসের জিওসি পদে বদলি করা হয়। কিন্তু মাসুদ চেয়েছিলেন ডিজি,ডিজিএফআই বা সিজিএস হতে। মাসুদ তার কাঙ্খিত পদ পাননি। ফলশ্রুতিতে বেগম জিয়ার ওপর দিনে দিনে তার ক্ষোভ বাড়তে থাকে। উচ্চাভিলাষী মাসুদ পরবর্তীতে ২০০৫ সালে লবিং করেছিলেন সেনাবাহিনী প্রধান হওয়ার জন্য। অন্যদিকে নোয়াখালী ইজমের কারণে কোর্সমেট মইন উ আহমেদকে এ পদে নিয়োগের জন্য সাঈদ এস্কান্দার জোরালো তদবির করেন খালেদা জিয়ার কাছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে নোয়াখালীর কয়েকজন মন্ত্রী-এমপিদেরও সুপারিশ ছিল। অবশেষে ১৬ই জুন ২০০৫ দশজন পেশাদার সিনিয়র জেনারেলকে ডিঙিয়ে মইন ইউ আহমেদকে সেনাপ্রধান করেন খালেদা জিয়া। সেনাপতি হবার স্বপ্নভঙ্গে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকেন মাসুদ এবং প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

ড্যান্ডি ডাইংয়ের ব্যবসায়িক ভাগ-বাটোয়ারা এবং বন্ধু মামুনকে নিয়ে তারেক রহমানের ওপর সাইদ এস্কান্দার ক্ষিপ্ত ছিলেন। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে সিনিয়র যুগ্মমহাসচিব তারেক রহমান মফস্বলে বিএনপির সাংগঠনিক সফর শুরু করেন ফেনী থেকে। সড়কপথে এ সফরে যাওয়ার সময় তারেক রহমানের ওপর কুমিল্লায় মাসুদ এ্যামবুশ করতে পারেন, এরূপ গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয় তারেক রহমানের নিরাপত্তার জন্য। মাসুদ ছিলেন তার জ্যেঠাস নাসরিনের পরম পুরুষ। বিশেষ সম্পর্কের সুবাদে ২০০১ সালের পরে মাসুদের উত্থানের সকল দায়িত্ব নেন নাসরিন। বেগম জিয়াকে দিয়ে মাসুদের পদোন্নতি ও ভালো পোষ্টিংয়ের ব্যবস্থা করেন তিনি। ২০০৫ সালে নাসরিনের অনুরোধে মাসুদকে কুমিল্লা থেকে এনে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি নিয়োগ করা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বেগম জিয়া তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। ভারতীয় লবির সাবেক রক্ষী বাহিনীর এ কর্মকর্তার বিশ্বস্ততা নিয়ে বেগম জিয়া দুচিন্তায় পড়ে যান। কিন্তু সাঈদ এস্কান্দার এবং ভাগ্নে সাইফুল ইসলাম ডিউকের মাধ্যমে মাসুদের সাভারের পোষ্টিং টিকে যায়। তারেক রহমানের সাথে মাসুদের মনস্তাত্বিক সংঘাত সৃষ্টি হয় বিভিন্ন কারনে। জানা যায়,

২০০৬ সালের শেষের দিকে মাসুদ বেগম জিয়ার সাথে দেখা করে সংসদ নির্বাচন পেছানোর প্রস্তাব দেন। সেখানে তারেক রহমানও উপস্থিত ছিলেন। তারেক রহমান এ বিষয় নিয়ে মাসুদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া মেয়ের বিয়ের দাওয়াত দেয়ার জন্য তারেক রহমানের সাথে হাওয়া ভবনে দেখা করতে যান মাসুদ। তারেক রহমানের সহকারী অপু মেজর জেনারেল মাসুদকে দেখা করতে না দিয়ে বলেছিলেন, তারেক রহমানকে মামা না বলে স্যার বলে সম্বোধন করতে। তারেক-মাসুদ সম্পর্ক নিয়ে ১/১১র পরে এরূপ নানাবিধ রটনা বের হয় মাসুদের বরাতে ।এ সকল ছোট ছোট ব্যক্তিগত মনোমালিন্য ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের খবর মাসুদ শেয়ার করতেন সহকর্মী জেনারেলদের সাথে। প্রকৃতপক্ষে ২০০৬ সালের অক্টোবর থেকেই মাসুদ কয়েকজন মেজর জেনারেলকে উস্কাতে থাকেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য। অন্যদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য ভারত পুরাতন এ ভাবশিষ্যকে ব্যবহার করে চমৎকারভাবে। ১/১১র আগে অন্য ব্যক্তির মোবাইল ফোনে মেজর জেনারেল মাসুদ ২ দফা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মোখলেসুর রহমান চৌধুরীকে ফোন করেন। দু'বারই তিনি রাষ্ট্রিপতির উপদেষ্টাকে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এ নিয়ে মাসুদ তার সাথে বৈঠকে বসার আগ্রহও ব্যক্ত করেছিলেন। ওয়ান ইলেভেনের দিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে জোর করে সাক্ষর আদায়ের পরে সামরিক সচিবের কক্ষে বসে মইন-মাসুদ-আমিনুল করিম-রুমী-বারী রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেন রাত্রিকালে কারফিউ জারী করার। পরে মেজর জেনারেল মাসুদ ও ব্রিগেডিয়ার বারী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মোখলেস চৌধুরীর কক্ষে এসে সেখান থেকে তথ্য সচিবসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফোন করে কারফিউ জারীর কথা জানান।

১/১১র পরে কেয়ার টেকার সরকার গঠনে মে: জেনারেল মাসুদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশী। জেনারেল মইন এ বিষয়ে তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন, "মেজর জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী ড. ফখরুদ্দীনের বাসায় যান এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করেন।------বেসামরিক পরিমন্ডলে প্রথিতযশা কৃতি মানুষদের ব্যাপারে আমার জ্ঞান ছিলো সীমিত। এ সময়ে দেশের গোয়েন্দা বিভাগ ও সাভার ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে সর্বাত্মক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে। সাভার ডিভিশনের জিওসি দীর্ঘদিন ডিজিএফআই-এ কর্মরত থাকার সুবাদে তাঁর মতামত এ পরিষদ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

১/১১র পরে মাসুদ তার ব্যক্তিগত ক্ষোভের প্রতিশোধে বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। ২০০৭ সালের ৭ই মার্চ তারেক রহমানকে আটক করার পেছনে মাসুদ-সাঈদের ভূমিকা ছিল মূখ্য, এ বিষয়ে সেনাপ্রধান মইনের নির্দেশও ছিল পরিস্কার। ইন্টারোগেশন সেলে লে: জেনারেল মাসুদের উপস্থিতিতে নির্যাতনের পরে তারেক রহমানের মুখের কালো কাপড় খুলে মাসুদ সদম্ভে উপহাস করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "দেখ্, বেটা চিনতে পারিস কিনা?" লে: জেনারেল মাসুদের স্ত্রী জেসমিন মাসুদও এ বিষয়ে কম যান নি। তারেক রহমান আটক হওয়ার পরে একটা বিহিত করার জন্য তারেক পত্নী ডা: জুবাইদা আত্মীয়তার সূত্র ধরে মাসুদের স্ত্রীর নিকট গেলে তিনি দম্ভ করে বলেছিলেন,'তোমাকে তো ৮ বছরের জেল দেয়া হবে।' এসময় জিয়া পরিবারের কোন্ একাউন্ট চালু থাকবে, কার একাউন্ট থেকে কত টাকা তুলতে পারবে তা নির্ধারন করতেন জেসমিন মাসুদ। এভাবেই নেপালের রাজ পরিবারের মতো পারিবারিক কলহে জিয়া পরিবারকে নির্ব্বংশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মাসুদ- সাঈদ গং।

যদিও সেনাপ্রধান হওয়ার নেশায় মইনের সঙ্গে মাসুদের প্রতিযোগিতা ছিল, কিন্তু জিয়া পরিবার ধ্বংস করার প্রশ্নে দু'জনের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন মইনের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এমএসপি মেজর জেনারেল আমিনুল করিম। সামরিক অভ্যুত্থান সফল হলে মইন প্রেসিডেন্ট ও মাসুদ সেনাপতি হওয়ার ভাগাভাগিতে তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়। ড. ফখরউদ্দিনের সরকার গঠনের পরে মইন-মাসুদগং দুর্নীতি দমনের নামে ক্রাকডাউনে নামে। পূর্ব থেকে প্রস্তুত করা তালিকা

অনুযায়ী রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলাদের বিনা ওয়ারেন্টে আটক শুরু করে সৈন্যরা। এসময় দুর্নীতিসহ গুরুতর অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি'(এনসিসি)র প্রধান সমন্বয়ক হন মেজর জেনারেল মাসুদ। কাকে ধরা হবে কাকে ছাড়া হবে এটা নির্ধারন করত মইন ও মাসুদ। যদিও নামকাওয়াস্তে এ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এম এ মতিনকে। কিন্তু মূলত দুর্নীতি দমন কমিশনের কাজ চলত মাসুদের ইচ্ছামত। এনিয়ে মাসুদের সঙ্গে দুদক চেয়ারম্যান হাসান মসহুদ চৌধুরী ও উপদেষ্টা এম এ মতিনের বিরোধ তৈরী হয়। এ কমিটির তত্তাবধানেই পরবর্তীতে ধরপাকড়ের তালিকা তৈরী ও ম্যানেজ হয়ে গেলে দরকারমত নাম কর্তন করা হতো। এভাবেই মাসুদউদ্দিন চৌধুরীকে দিয়ে সদ্যবিদায়ী বিএনপি সরকারের নেতাদের ও জিয়া পরিবারকে আটক ও নির্যাতনের জন্য মইন 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা' তোলার নীতি অনুসরন করেন। মইন-মাসুদের নির্দেশে মাইনাস টু ফর্মুলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনাকে দেশ থেকে বের করার জন্য নানাবিধ কৌশলে চাপ প্রয়োগ করা হয়। দলীয় নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য মান্নান ভূঁইয়ার দ্বারা বিএনপির এবং আবদুর রাজ্জাককে দিয়ে আওয়ামীলীগের সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। খালেদা জিয়া ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও রাজনীতি পারিবারিকীকরনের অভিযোগ এনে চাপের মুখে নেতাদের গণমাধ্যমে বক্তৃতা বিবৃতি দিতে বাধ্য করা হয়। ব্যবসায়ীদের ধরে এনে ভয়ভীতি দেখিয়ে আদায় করা কোটি কোটি টাকায় প্রথমে মান্নান ভূঁইয়াকে দিয়ে বিএনপি ভেঙ্গে নতুন দল গঠনের চেষ্টা করা হয়। এর পরে ২৮ অক্টোবর ২০০৭ মধ্যরাতে অস্ত্রের মুখে সাইফুর রহমান-মেজর হাফিজকে দিয়ে বিএনপির নেতৃত্ব হাইজ্যাকের চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে মইনের ক্ষমতারোহনের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহারের জন্য মইনের আত্মীয় ফেরদৌস কোরেশীকে দিয়ে কিংস পার্টি 'পিডিপি' গঠন করা হয়। বেগম জিয়াকে বাগে আনার জন্য নানা উপায়ে চাপ প্রয়োগ করা থেকে শুরু করে তারেক রহমানকে বেআইনীভাবে আটক করে রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক নির্যাতন করে মেরুদ ভেঙ্গে প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। পরে ডজনখানেক মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পোড়া হয়। এ সময়ে খালেদা জিয়াকে বিদেশে নির্বাসনে যেতে রাজী করানোর দূতিয়ালীতে অতীব তৎপর ছিলেন তাঁরই ছোটভাই অবসরপ্রাপ্ত মেজর সাঈদ এস্কান্দার। খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর পরে এই সাইদ এস্কান্দারকে বিএনপি-র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করার পরিকল্পনাও করেছিলেন মইন-মাসুদ। কিন্তু বেগম জিয়ার দৃঢ় মনোবল ও আপোষহীনতার কাছে বার বার পরাজিত হয়েছে মইন-মাসুদরা। উদ্দেশ্য সাধন না হওয়ায় আরেক ছেলে কোকোসহ খালেদা জিয়াকে আটক করে কয়েকটি বানোয়াট মামলা দায়ের করা হয়। এর আগে আরেক নেত্রী শেখ হাসিনাকে টেনে হিঁচড়ে অপমানজনকভাবে আটক করে তাকেও মিথ্যা মামলা দেয়া হয়। আটককালে সুধাসদন থেকে আটক প্রায় ৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে মইন-মাসুদ গংয়ের বিরুদ্ধে। সমতা দেখানোর জন্য মেজর জেনারেল মাসুদের সিদ্ধান্তে শেখ হাসিনাকে আগেই আটক করা হয়েছিল বলে পরবর্তীতে জেনারেল মইন দাবি করেন। রাজনৈতিক নেতাদের আটক করার জন্য মইন-মাসুদের নির্দেশে সংশ্লিষ্টরা আগেই তালিকা তৈরি করেছিলেন। তাদের পছন্দমত দল করতে রাজি না হওয়ায় শত শত রাজনীতিককে আটক করে চোখ বেঁধে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বিএনপি-আওয়ামীলীগের অসংখ্য জাতীয় নেতা নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়েছেন গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের আটক করে ভয়ভীতি দেখিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে তুলে কিয়দংশ কোষাগারে জমা দিয়ে বাকিটা নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন মইন-মাসুদ চক্র। এর ফলে দেশে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে, ব্যবসা-বানিজ্য স্থবির হয়ে যায়, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। 'কাউকে ছাড়া হবে না' ঘোষণা দিয়ে এভাবে নিজেরাই দেশের সম্পদ লুট করেন তস্করের ন্যায়।

মেজর জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর নবম পদাতিক ডিভিশনের শক্তির ওপর ভর করেই ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করেন মইন। মাসুদের সহায়তা ছাড়া মইন কোনো অবস্থাতেই ওয়ান ইলেভেন ঘটাতে পারতেন না। ওয়ান ইলেভেনের পর শুরুতে চুপচাপ ছিলেন মইন, কলকাঠি নাড়তেন নেপথ্যে থেকে। ক'দিন পর তিনি দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন স্বরূপে। একে একে ওয়ান-ইলেভেনের রূপকারদের সরিয়ে দিয়ে নিজের পথকে কণ্টকমুক্ত করতে থাকেন জেনারেল মইন। সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেন তিনি। সরকার প্রধানের মতো সেনাপ্রধানও নীতি-নির্ধারণী বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। ড. ফখরউদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন নামকাওয়াস্তে- এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে জাতির কাছে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব সিদ্ধান্ত আসতো ক্যান্টনমেন্ট থেকে। একপর্যায়ে মাসুদ নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন । অন্যদিকে মইনের ভয় ছিল সাভার ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্বে থাকা মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে নিয়ে। মাসুদের উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে সজাগ থেকেই মইন তাকে নবম ডিভিশন থেকে সরানোর উদ্যোগ নেন। মইন উ আহমেদ নিজে জেনারেল হতে গিয়ে কৌশল করে আরো চার জনকে লে: জেনারেল পদে উন্নীত করেন। পদোন্নতির মাধ্যমে নবম ডিভিশন থেকে মাসুদউদ্দিনকে সরিয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) করা হয়। কমান্ড হারিয়ে লে. জেনারেল মাসুদ অপ্রস্তুত ও ভীষণ ক্ষুব্ধ হন। নীরবে শুরু হয় বিরোধ। এক কান দুই কান হয়ে কথা ক্যান্টনমেন্টের সীমানা ছেড়ে চলে আসে বাইরে। টের পান চতুর জেনারেল মইনও। নবম ডিভিশন থেকে সরিয়েও স্বস্তি বোধ করতে পারেননি তিনি। ততোদিনে মাসুদ ঘুঁটি পাকাচ্ছিলেন জেনারেল মইনের বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি মাসুদের। ২০০৮ সালের মে মাসে সেনাপ্রধান মইনের গ্রীস সফরকালে লে: জেনারেল মাসুদ সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেন। সে লক্ষ্যে মাসুদ রাষ্ট্রপতির সাথে দেখাও করেন। কিন্তু এ যাত্রায় মইনের অনুগত এমএসপি আমিনুল করিম সেনাপ্রধানের কাছে বিষয়টি জানিয়ে দেন। মাসুদ আটক হন, কিছুদিন গৃহবন্দি থাকেন। অতঃপর ৩রা জুন ২০০৮ মাসুদকে পিএসও থেকে সরিয়ে ডিফেন্স কলেজে পোষ্টিং দেন জেনারেল মইন । পরেরদিনই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয় মাসুদের চাকরি। এ পর্যায়ে অতীতের কৃতকর্মের জন্য খালেদা জিয়ার কাছে মাফ চাওয়ার চেষ্টা করেন মাসুদ। কথা বলতে চাইলেন কারাবন্দী খালেদা জিয়ার সঙ্গে, কিন্তু অনুমতি পেলেন না। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর অবশেষে তিনি রাষ্ট্রদূতের চাকরিতেই যোগ দিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। এ ব্যর্থ ক্যু নিয়ে মাসুদের সাথে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারীসহ কয়েক সেনা কর্মকর্তার ফোনালাপের টেপও পেয়ে যান সেনাপতি মইন। যার ফলে, জড়িতদের বিরদ্ধে ব্যবস্থা নেন মইন, ব্যাপক পরিবর্তন হয় সেনাবাহিনীর কমান্ডে ও গোয়েন্দা বিভাগে। বস্তুত ওয়ান ইলেভেন ছিল বেইমানির ইতিহাস। এখানে কে কার সাথে কখন বেইমানি করবে এটাই ছিল মূখ্য। মাসুদ আমিনুল করিমকে বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু মইন একই সাথে মাসুদ ও আমিনুল করিমকে সেনাপ্রধান করার আশ্বাস দিয়ে রেখেছিলেন। মইন এবং মাসুদ দু'জনেরই খায়েশ ছিল মসনদের। আর বঙ্গভবনে সামরিক সচিবের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমিনুল করিম মনে করতেন প্রেসিডেন্ট পদটা তো খুব কাছাকাছি। দুই রুমী যদিও আর্মির কমান্ডে ছিলেন না, তবুও দায়িত্ব পালনের সুবাদে ক্ষমতার খুব কাছাকাছি থাকায় এরাও সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীণ হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। একই অবস্থা ছিল ফজলুল বারী ও এটিএম আমিনের ক্ষেত্রে। মূলত ওয়ান ইলেভেন পরবর্তী সময়ে এরাই দেশ চালিয়েছেন, ড. ফখরউদ্দিন ছিলেন পুতুল মাত্র।

২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে ১/১১র কুশীলবদের একে একে ভাগ্যপতন ঘটছে। এ সময়ে মাসুদ তার পুরোনো উপকারভোগী বর্তমান সরকারের যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন ও উপদেষ্টা তারেক সিদ্দিকীর মাধ্যমে রাষ্ট্রদূতের চাকরিটি টিকিয়ে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মাসুদ বোধ হয় ভুলে গেছেন, বেইমানদের কোথাও কোন জায়গা নেই। শেখ

হাসিনা ভালোভাবেই জানেন, একবার যে বেইমানী করে সে বারবার তা করতে পারে। মইন-বারী-আমিন-রুমী-আমিনুল করিমের মতই মাসুদ ভুপাতিত হবে কোনো সময়।